International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-II, September 2017, Page No. 11-20
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

তারাশঙ্করের নারী : অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণের আলোকে

Aparna Deb

Assistant Professor, Department Of Bengali, Santosh Kumar Roy College, Hailakandi, Assam, India

Abstract

One of the prominent writers of Bengali fiction after Rabindra Nath Tagore, Tarasankar Bandyopadhyay basing his writings especially in his short stories depicted the social position of men and women of those bygone days. He achieved vastness and grounder in literature as he could set upon and place the male and female characters in their real perspectives. He dealt in his writings, inter alia, the idea of plain living and high thinking which have become the real essence of his literature. It is due to his real love towards humanity; Tarasankar could portray and define life in its truest sense. It is found that writers of all ranks in those bygone days especially writers of short stories, put less importance and bestowed less labour to women folk for the reason best known to them, but the Tarasankar was exception to them. He was mainly preoccupied and concerned with weal and woe, about dangers and difficulties of human life which surround people in their way of life.

Since the birth of Bengali short story, the authors gave status to the individual form of women in a different way. The realist artist Tarasankar is also of no exception. Tarasankar is a humanist artist in the sense that he is always engaged with the feelings of happiness, sadness and danger of man. So, in the writings of Tarasankar consisting of women's faults, weaknesses, jealousies, angers, forgivenesses, cruelties; love and violence; didn't leave anything untouched. He didn't take into consideration of rights and wrongs or the good and bad regarding women. He pictured Radha's dusty life in his story. Among the women out there, finding just even a single rational mind is near to impossible. Tarasankar gave place to the backward, neglected and deprived women of the society in literature. In the nineteenth century, they didn't have even a bit of concurrence with teachings and learning. Therefore, there is no rational mind found among his women. Because of the absence of logical love among them, they are ready to sacrifice anything for love. Love is affection, a connection between the souls and minds of the male and female. Love is meant to be forever but its attitude changes. As believes, behaviours, opinions and outlook of man changes, likewise love also changes. Tarasankar's short story is all about our world, house and family, how colourful then turns up with the fragrance of love and their reflections. In order to reflect this love he didn't show any inhumanity towards the women instead he kept their complete dignity in his creation. The women of his literature are illuminated through his life-style. It is due to real love towards humanity, Tarasankar could portray the life in its true meaning almost in all his writings.

Key words: grounder, humanist, jealousies, literature, short story, women folk, weaknesses.

জীবন পথের ভাবুক পথিক তারাশঙ্কর। ভাব তো রূপের মধ্যেই সঙ্গ খুঁজে নেয়। ভাবুক তারাশঙ্করের সত্তা তাই নানা রূপে ঠাঁই নিয়েছিল সাহিত্যাঙ্গনে। বেশ দীর্ঘসময় ধরে তারাশঙ্কর বাংলা কথা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে ছিল বিশালত্ব ও বৈচিত্র্য। সমাজের সকল স্তরের মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে সাহিত্যে ঠাঁই নিয়েছে। নিজে জমিদার বংশের সন্তান হয়েও নিচু স্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। মিশেছেন আউল-বাউল, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বেদে- এইসব মানুষের সঙ্গে। বাস্তবে দেখা ও মেলামেশা করা বলেই তাঁর চরিত্রগুলি এত জীবন্ত। সমাজের নিচুস্তরের মানুষজনকে খুব কাছ থেকে দেখে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাদেরকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করাই তারাশঙ্করের সাহিত্যের মৌলিকতা এ কথা বলতেও দ্বিধা নেই।

সমাজকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠে সাহিত্যজগত। সে জগতের কথা বলতে গিয়ে সমাজের প্রধান চালিকাশক্তি মানুষ তো এসেই যায়। এই মানুষ আবার দু'ভাগে বিভক্ত— নারী ও পুরুষ। প্রাচীনকাল থেকেই নারী ও পুরুষ সাহিত্যের আঙ্গিনায় আধিপত্য বিস্তার করে আসছে একছত্রভাবে। কিন্তু নারী হচ্ছে সেই সত্তা, যার উপস্থিতিতে পুরুষের ব্যক্তিত্বের পরিকাঠামোয় পূর্ণতা আনে। জন্মগত, কর্মগত, পেশাগত ক্ষেত্রেও নারী, পুরুষের চোখে বা নারীই নারীর চোখে ভিন্ন মাত্রা পায়। আর মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয় সমাজের তথাকথিত প্রগতির বাস্তবতার ছবি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে অন্যান্য দিকগুলির সঙ্গে মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। 'নারীমুক্তি' বলতে যে শব্দটির সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়ত নিজের ভাবনার জগতের পরিবর্তন আনতে চাইছি, তার ভিত প্রস্তুত হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত ও বঞ্চিত নারীদেরকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে। ধীরে ধীরে নারীরাও নিজের অবস্থান নিয়ে চর্চা করতে শুরু করে। তার উপর সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, নারী ও পুরুষ উভয়কে সচেতন করে তুলে। যদিও এর বিপক্ষেও অনেকেই ছিলেন। নারীরা আজ নিজেদের অধিকার নিয়ে, নিজেদের অবস্থান নিয়ে সচেতন হয়েছে, প্রতিবাদ করছে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। শুধু তাই নয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি নারী সাহিত্যের মাধ্যমে এই আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছে।

আবহমান কাল ধরে মানবসমাজে নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সমাজে এই সংখ্যার সামান্য কিছু হেরফের ঘটলেও মোটামুটি এর সমানুপাত আশ্চর্যজনক ভাবে অপরিবর্তিত রয়েছে। কিন্তু পরিণামগত সাম্য থাকলেও সমাজে নারীর গুণগত সাম্য এখন পর্যন্ত কোথাও রক্ষিত হয়নি। নারীর গুণগত সাম্যের প্রশ্নে মূল ভূমিকা থাকে সমাজের। সে সমাজ পুরুষতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক অনুশাসনে নারী বন্দিনী হয়েছে চিরকাল। উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে অন্ত্যজ স্তরের নারীদের জীবনচর্যায় পুরুষের প্রভাব খুব গুরুতর। উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়ে আমরা বুঝতে পারলাম নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়োজন আছে। সমাজের অর্ধেক অংশ বলেই তার নির্ণায়ক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া আশু প্রয়োজন। বিশ শতকে এসে আমরা এই উপলব্ধির শরিক হতে পেরেছি সম্যকভাবে।

তারাশঙ্কর নিজে উনিশ শতকীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি তাঁর রচনার মধ্যে নাগরিক বৃত্ত থেকে বহুদূরে অবস্থিত নারীর জীবন প্রণালী আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই এলাকাটি ছিল লেখকের অবাল্য পরিচিতি বীরভূম। তাঁর চরিত্ররা এই এলাকার সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা দ্বারা পোষিত ও অভ্যস্ত ছিল। উনিশ শতকীয় শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে তাদের বিন্দুমাত্র সংশ্রব ছিল না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিপুল বৈচিত্র্য সম্ভার থেকেই তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যে মাটি, মানুষ ও জীবনকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। তাই তারাশঙ্করের সাহিত্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের গুরুত্ব নেই। তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজ সত্যের চেয়েও জীবন সত্যের রূপায়ণ।

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে রাঢ়ের জীবন চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে জীবনের সত্যকে অন্বেষণ করেছেন। জীবনের বিচিত্র কলরোলে তাঁর গল্পগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যদিও মানবজীবনের এই কোলাহলে লেখক নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। কয়েকটি ছোটগল্পে তারাশঙ্কর কেন্দ্রীয় চরিত্র দাঁড় করিয়ে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার মালা গেঁথেছেন। মানুষের জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র চিত্রগুলি নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে বিচিত্র চিত্রপট তৈরি করেছে।

বিচিত্র নারী চরিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথমাবধি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নিজের ভাবনা কল্পনার বর্ণে চরিত্রগুলিকে অঙ্কন করেন না বলেই তাদের অধিকতর জীবন্ত বলে মনে হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত বা শিক্ষিত নারীর চরিত্রাঙ্কনে তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল না। নিম্নশ্রেণির শ্রমজীবী নারীর প্রতিই তাঁর লেখনী আত্মপ্রকাশ করেছে। কিছু কিছু গল্পে তাদের ভূমিকা সামান্য হলেও তাদের মধ্যে প্রাণের যে আলো তিনি জ্বালিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছেন তা আমাদের পাঠক মনের গভীরে ছাপ রেখে গেছে। আলো-ছায়ার বহুবর্ণে তাঁর চরিত্র বেশ জটিল হয়েও উঠেছে। আর শ্রমজীবী গ্রামীণ নারীরা প্রাণের ও প্রকৃতির সহজ আকর্ষণে কর্মমুখর হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত নারীকে জড়িয়ে তিনি যে বৃহৎ জীবনের ছবি এঁকেছেন তাতেই তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছেন।

জীবন সন্ধানী তারাশঙ্কর জীবন রহস্যকে নানা পথে সন্ধান করতে গিয়ে অবক্ষয়িত বর্তমানের মধ্যেও নিজের আশাবাদী দৃষ্টিপাতে জীবন বিরোধী হয়ে ওঠেননি। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার চেয়ে হৃদয়াবেগের আস্থাই তাঁর বেশি ছিল। তাই তারাশঙ্করের শিল্পধর্ম আহত হয়নি। রাঢ়ের কর্মশীল মানুষের মধ্যে তিনি তাঁর জায়গা করে নিয়েছেন। তাই রাঢ়ের নানা শ্রেণির নারী, তাদের ভাষা ও বাচনভঙ্গির বিশিষ্টতা লেখকের মনোজগতের অলিতে গলিতে ভ্রমণ করে, পথশ্রান্ত পথিকের মতো সাহিত্যাঙ্গনে বিশ্রাম নিয়েছে। আর তাই তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে চরিত্রের চিত্রশালা। তাঁর গল্পের নারীরা পুতুলের মত অন্য নিয়ন্ত্রিত নয় - স্বনিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় উজ্জ্বল। রাঢ়ের সাধারণ নর-নারীর বিশ্বাস সংস্কার, আচার আচরণ তথা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সমস্ত দিক তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখেছেন এবং গল্পে তাকে রূপ দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার গ্রাম সমাজে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি দিক থেকে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তারাশঙ্কর সেই পরিবর্তনের কথাও তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন।

নারী চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে তারাশঙ্কর অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনকে সর্বতোভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কিছু কিছু গল্পে নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলি একে অন্যের পরিপূরক। কিছু গল্পে নারী তার ধর্ম, সংস্কার সব বিসর্জন দিয়েছেন প্রেমাস্পদের জন্য। নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি তাঁর গল্পে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিছু গল্পে নারীর পাশে পুরুষ ও নানা রকম সংস্কারে আবদ্ধ। আবার কিছু গল্পে নারীর অন্তর এক মুহূর্তে উজ্জ্বল। নারী চরিত্রগুলির মধ্যে যে ব্যাপকতা জটিলতা ও আকর্ষণীয়তা দেখা যায় তাঁর পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে তা অপেক্ষাকৃত কম। তবে তারাশঙ্করের প্রতিনিধিমূলক পুরুষ চরিত্রগুলি স্বল্প কথায় চিত্রিত ও উজ্জ্বল। তারাশঙ্কর তাঁর কথা সাহিত্যে যাদেরকে নায়ক বা নায়িকার আসনে বসিয়েছেন তারা অন্ত্যজ বা নিম্নবর্গের মানুষ। বেদেনী, চাষাভুষো, দোকানদার, পাঠশালার পণ্ডিত, কামার-কুমোর, ঝুমুর নাচিয়ে কবিয়াল, যাত্রার বেশ্যা অভিনেত্রী, বোষ্টমী, জনমজুর, বাউল, কসাই ভিখারী। অবশ্য পাশে পাশে মধ্যবিত্ত ভদ্র শিক্ষিত সমাজ আছে ধনী, দরিদ্র, আছে নানা মাপের জমিদার। পুরাতন মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ থেকে তারাশঙ্কর তাঁর গল্পের নারীকে মুক্ত করতে পেরেছেন। যার ফলে তার গল্পে প্রেম ও নৈতিকতার সমস্যা নিয়ে খুব চিন্তাভাবনা নেই, নেই নারীর সতীত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন? নিম্নবর্গের বন্ধনহীন মুক্তমনের ভালোবাসায়, নেই কোন বিবাহ বন্ধনের প্রবণতা, নারীর জীবনে বিয়েই যে একমাত্র লক্ষ্য নয়, এই স্বতন্ত্র ভাবনাও তার গল্পে পরিস্ফুট।

তারাশঙ্করের বিখ্যাত গল্প 'বেদেনী'। এই গল্পে গল্পকার তারাশঙ্কর নারী চরিত্রের বীভৎস রূপটিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। চরিত্রটি আবেগ ও অনুভূতির আতিশয্যে রঙ্গীন। তার চলারও বলার ছন্দে বেজে ওঠে বীভৎস ও চঞ্চল নারী মূর্তিটি। এই গল্পটি তারাশঙ্করের রচনাকে করে তুলেছে স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ও বৈচিত্র্যময়। বীরভূমের একটি সম্প্রদায় বেদে। বেদে সমাজের জীবন নিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন নানা গল্প। বেদে জীবনের সুন্দর প্রকাশ

ঘটেছে 'বেদেনী' গল্পে। বেদের মেয়ে রাধিকা এই গল্পের নায়িকা, বেদেরা ধর্মে মুসলমান আচারে পুরা হিন্দু। জীবিকায় বাজিকর সাপ ধরে, সাপ নাচিয়ে গান করে, বাঁদর ছাগল নিয়ে খেলা দেখায়, মেলায় তাঁবু খাটিয়ে কেউ কেউ বাঘ নিয়েও খেলা করে।

বেদেনী রাধিকার বিয়ে হয়েছিল সতের বছর বয়সে শিবপদের সঙ্গে। শিবপদ ধীর প্রকৃতির মানুষ। সাপ, বাঁদর, ছাগল ইত্যাদিতে তার আসক্তি ছিল না। সে বেতের কাজ করত। রাধিকা যখন সাপ নাচিয়ে গান গাইত শিবপদ বাঁশি বাজাত। সে রাধিকার ক্রীতদাসের মতো ছিল। সেই শিবপদকে ছেড়ে তার সমস্ত অর্থ নিয়ে রাধিকা চলে আসে শম্ভুর কাছে। পিঙ্গলবর্ণ উদ্ধত দৃষ্টি কঠোর বলিষ্ঠদেহ শম্ভুকে দেখে বেদেনীর ভালো লেগেছিল। ওদিকে শম্ভুও তার বিগত যৌবনা বৌকে ছেড়ে, রাধিকার সঙ্গে তাঁবু বাঁধে। এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে তারা বাজি দেখিয়ে বেড়ায়। কয়েক বৎসর পর শম্ভু বৃদ্ধ হলেও, বাইশ বছরের রাধিকা তখন চিরযৌবনা। সে কঙ্কালীতলার মেলাতেই প্রতিদ্বন্দ্বী বাজিকর কিষ্টো বেদেকে দেখে তাঁর আকর্ষণে পড়ে। কিষ্টো মানুষটিও বেশ,

> *"জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি*
> *অবয়বটি সবল এবং দৃঢ় দেখিলে চোখ জুড়াইয়া*
> *যায়।"*[১]

কিষ্টোকে দেখে রাধিকার বৃদ্ধ শম্ভুকে আর ভালো লাগার কথা নয়। তাদের তাবুতে ছিল জীর্ণ পোষাকে জরাজীর্ণ বাঘের খেলা। আর পাশেই কিষ্টো বেদের তাবুতে সবল পশুর হিংস্র রুদ্ধ গর্জন। রাধিকা ও শম্ভু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কিষ্টোকে জব্দ করার জন্য ঠিক করল রাতে কিষ্টোর তাবুটি কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। অপমানে রাধিকা জ্বলে উঠল। গভীর নিশীথে মেলাটা যখন শান্ত স্তব্ধ তখন দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুজো-কেরিসিনের টিন নিয়ে আগুন লাগাতে বেরিয়ে পড়ল। সরীসৃপের মতো বুক্র হেঁটে কিষ্টো বেদের তাবুতে পৌঁছে ওর পুরুষালি রূপ দেখে অবাক হয়ে গেল।

> *"কিষ্টোর কুঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস। উঃ বুকখানা কি*
> *চওড়া, হাতের পেশীগুলা কি নিটোল।"*[২]

উন্মত্ত বেদেনী মুহূর্তে উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিষ্টো জেগে উঠে ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল। শেষে বেদেনীর যুক্তিতে ওরা দুজনেই দেশান্তরী হওয়ার কামনায় তাবু থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিষ্টো বলে,

> *"দেশান্তর? ই তাঁবু টাবু*
> *যাক পর‍্যা। উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উয়ার রাধিকে লিবা*
> *উয়াকে দাম দিবা না?"*[৩]

যাবার আগে রাধিকা আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায় শম্ভুর তাঁবুতে। খিল খিল করে হেসে বলে,

> *"মরুক বুড়া পুড়্যা।"*[৪]

তারাশঙ্কর বেদেনী চরিত্রে অঙ্কনের মধ্য দিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য যৌবনের জয় ঘোষণা করেছেন। যৌবনের অস্থির উন্মাদনায় সে নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি। সময়ে সময়ে জীবনসঙ্গী পালটিয়ে নিয়েছে। বেদে রমনীর যাযাবরত্ব যেমন মনকে করে তুলেছে কঠিন নির্মম ও নিরাসক্ত, ঠিক তেমনি যৌবনের পরম চাহিদায় প্রেমকেও করে স্বভাবে যাযাবর। একের পর এক জীবনসঙ্গীকে পালটে সে জীবন ঐশ্বর্যকে ভোগ করেছে। প্রবৃত্তিটিকে তৃপ্ত করার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বনে সে দ্বিধা করে না। এ ধরনের রহস্যময়ী নারী চরিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্করের জুড়ি মেলা ভার।

তারাশঙ্করের তাঁর ছোটগল্পের সীমিত পরিসরে যে সাংসারিক ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। নারী চরিত্র রহস্য ভরা। এই রহস্যময় নারী চরিত্র অঙ্কনে বিচিত্র রূপা সাংসারিক পটভূমি ও অতুলনীয় ভূমিকা নেয়। তাই সংসারে নারীকে কখনও দেখা যায় ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত, স্বামী সন্তান সেবায় নিবেদিত প্রাণ। পর আপন সকলকে আপনার মতো দান করে স্নেহ, মায়া ও প্রেম। নিজ স্বার্থ মুহূর্তে ত্যাগ করে অপরের জন্য সর্বস্ব অকাতরে দান করতে পারে, নিজের সুখ শান্তি বিলিয়ে দিয়ে সীমাহীন দুঃখ যন্ত্রণা বহন করতেও পারে। সংসারে তাই নারী কখনও মায়াবিনী আবার অন্যদিকে ধ্বংস কামনায় কখনও নারী রাক্ষুসীও। কেউ আবার আধুনিকতার ছোঁয়ায় বিলাসিনী, বিলাস বাসনাকে চরিতার্থ করে তারা সব সম্পর্কটিকে তুচ্ছ করতেও পারে।

এক সাংসারিক পটভূমিকায় তারাশঙ্কর তাঁর 'তারিণীমাঝি' গল্পটি অঙ্কন করেছেন। যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর ভালোবাসার বন্ধন প্রগাঢ় হওয়া সত্ত্বেও তারিণী মাঝি ভুলে যায় সুখীর ভালবাসা। জীবধর্মের কাছে প্রাণই সবচেয়ে প্রিয়, কেবল মানুষের নয়, সব জীবের ক্ষেত্রে এটা সত্য। তারাশঙ্করের বহুপ্রশংসিত গল্প 'তারিণী মাঝি' প্রসঙ্গে এই উক্তিটির সত্যতা অনস্বীকার্য। যদিও সেই সঙ্গে উঠে আসে সহজ, সরল, অশিক্ষিত গ্রাম্য বধুর সাংসারিক ছবি।

নিসন্তান 'তারিণী মাঝি' ও তার স্ত্রী 'সুখী' - সত্যই সুখী ছিল। স্বামীর দুঃখে স্ত্রী দুঃখী, স্বামীর সুখে স্ত্রী সুখী। স্বামীই রমণীর সর্বস্ব। অলংকার, ধর্ম, সম্মান গর্ব সব কিছু। প্রাচীন কাল থেকে সংসার ও স্বামী সম্পর্কে আমাদের মনে যে ভারতীয়ত্ব বোধ গড়ে উঠেছে তা গল্পটিতে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। ভারতীয় রমণীদের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ হল স্বামী। তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পে সুখী এমনই এক পতিপ্রাণা রমণী।

ময়ূরাক্ষীর ভয়াবহ বন্যায় যে দিন সমস্ত গ্রাম ডুবে গেল, সে দিনও কিন্তু প্রাণভয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে যায় নি। দাওয়ার উপর এক হাটু জলে চালের বাঁশ ধরে তারিণীর জন্য দাঁড়িয়েছিল,

> *"তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। কোথা খুঁজে বেড়াতে*
> *বল দেখি?"*[৫]

ময়ূরাক্ষীর গনুটিয়া ঘাটের খেয়া পারাপারের মাঝি তারিণী। নদীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড়। ময়ূরাক্ষী সারা বৎসর জনহীন ধূ ধূ বালি নিয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু বর্ষার জলে হয়ে ওঠে ভয়ঙ্করী। মাঝে মাঝে সর্বগ্রাসী বন্যায় হেসে ওঠে রাক্ষুসীর মতো। তারিণী শুধু মাঝি নয়, নদীর বুকে কেউ ডুবতে বসলে তাকে তুলে আনে সাতারুর পটুতায়। প্রতিদানে যা পুরস্কার পায় তা দিয়ে তার স্ত্রী সুখীকে সাজিয়ে তুলে আরো বেশি সুখী করতে চায়। সুখীর প্রতি তার ভালবাসার সীমা নেই। সুখী হয়তো সন্তান দিতে পারেনি তবে দিয়েছে অগাধ ভালবাসা আর নির্ভরতা। সে কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে তারিণী,

> *"সুখী বড় ভাল রে কেলে, বড় ভাল। উ না থাকলে*
> *আমার 'হাড়ির ললাটে ডোমের দুগ্‌গতি' হয় ভাই।"*[৬]

বকশিস পেয়ে অহ্লাদিত তারিণী আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়ী ফেরে, দরজায় অপেক্ষারত স্ত্রীকে দেখে গান ধরে,

> *"লো তুন হয়েছে দেশে ফাঁদি লতের আমদানি।"*[৭]

স্বামী-স্ত্রীর সাংসারিক দারিদ্র্যে প্রেম ছিল সমস্ত অভাব অনটনকে ছাপিয়ে। নারীর গহনার প্রতি আসক্তি চিরদিনের। সেই গহনাও সুখী নীরবে বিক্রি করেছে সংসার যাত্রা নির্বাহ করার জন্য, এর জন্য স্বামীকে কোনদিনই একটি কথাও বলেনি। সংসারী মানুষ হিসেবে স্বামীর সব রকম ত্রুটিকে সে প্রশ্রয় দিয়েছে।

দারিদ্র্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় তারিণী ও সুখীর পরম প্রশান্তির সুখ নীড় ভেঙ্গে দিলেও ভাঙতে পারেননি তাদের হৃদয় বন্ধন। তারিণীর যোগ্য সহধর্মিনী রূপে সুখী পুরো গল্পে বর্তমান। সুখী তারিণীর জীবনের সুখের মধুভাণ্ড। সে কেবল স্বামী সোহাগিনী নয়, স্বামীর প্রতি একান্ত বিশ্বাস পরায়ণ ও নির্ভরশীলা রমণী। নারীর ধর্ম যদি রক্ষা বা নীড়

রচনা করা হয়, তাহলে সুখী তাই করেছে। যে আশ্রয় চায় পুরুষের শক্তির কাছে, যার ওপর দাঁড়িয়ে সে রক্ষা করবে নীড়। এই আশ্রয় দেবার ক্ষমতা পুরুষের মধ্যে কামনা করে নারী – সুখীও করেছে।

ময়ূরাক্ষী বন্যায় রাক্ষুসী রূপ ধারণ করলে নদী আর ভূমি এক হয়ে যায়। মানুষেরা ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বের হয়। তারিণীও সুখীকে পিঠে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। রাতের অন্ধকারে পথ ভুল করে খরস্রোতা ময়ূরাক্ষীর বুকে এসে পড়ে। ময়ূরাক্ষী পলকে রাক্ষুসী রূপ ধারণ করলে, তারিণী সুখীকে বলল,

> *"পিঠ ছেড়ে আমার কোমরের কাপড় ধরে ভেসে থাক।"*[৮]

প্রবল নির্ভরতায় সুখী তাই করেছিল। ময়ূরাক্ষীর বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতিতে এই সময় তারিণীও তার প্রাণপ্রিয় সুখীকে ডেকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল,

> *"ভয় কী আমি তোর, সঙ্গে রইছি।"*[৯]

কিন্তু নিয়তির কাছে মানুষ বড় অসহায়। নদীর বুকে ইতিপূর্বে দক্ষ মাঝির চরম পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। একদিকে প্রিয়তমা স্ত্রী অপরদিকে নিজের প্রাণ রক্ষার তাগিদ। সমস্ত শক্তি দিয়ে তারিণী জল ঠেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ময়ূরাক্ষীর তরঙ্গ যেন তারিণীর শ্বাসরোধ করে দেয়। জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে স্নেহ মমতা সব কিছুই প্রবৃত্তির উচ্ছাসে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রাণ মানুষের কাছে কত প্রিয় তা তারিণীর আচরণেই প্রকাশ পায়,

> *"যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ। হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল।"*[১০]

প্রেম ও আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বে তারিণী শেষ পর্যন্ত সুখীকে গলা টিপে হত্যা করে নিজে বাঁচার পথ খুঁজে পায়। আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির হাতে প্রেমের পরাজয়ে ঘটেছে।

স্বামীর প্রতি একান্ত বিশ্বাস পরায়ণ ও নির্ভরশীলা রমণী সুখী এত বড় বিপদের মধ্যেও নিরুদ্বিগমনা ছিল। কেননা সুখী জানত যার উপর নির্ভর করে আছে, সেই ব্যক্তি তার স্বামী তারিণী, ময়ূরাক্ষীর বন্যার সবচেয়ে বড় ত্রাতা। কিন্তু সেই প্রেমে মানবিক চাওয়া পাওয়ার অধিকার তুচ্ছ হয়ে গেছে স্বামীর হাতে তার অসহায় মৃত্যুতে।

গল্পের নিরক্ষর গ্রাম্য রমণীর সংসারে কল্যাণচিন্তায়, সেবাপরায়ণতার ছবি আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলেও শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলে। মহৎ স্রষ্টার কলমটিকে তাই চিনে নিতেও অসুবিধা হয় না।

চরিত্র সৃষ্টির জন্য তারাশঙ্কর বাংলা কথাসাহিত্যে অনন্য ব্যক্তিত্ব। কারণ চরিত্র এবং মুখের ভাষা দুই-ই তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধার করেছেন। অব্যর্থ বর্ণনায় এক একটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার কাজে তার দক্ষতা অসামান্য।

দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তারাশঙ্কর নানা রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্প লিখেছেন। তাই তাঁর বহুগল্পে জটিল মনস্তত্ত্ব সম্পন্ন রহস্যময়ী প্রকৃতির অনুগামী নারী চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য জগতের নারীরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়েও যেন নূতন নূতন উপলব্ধি উদ্বোধনের সহায়ক। শুধু প্রেম ও জীবনের দ্বন্দ্বে নয়, জীবনের অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে দু-মুঠো খেয়ে পরে জীবন ধারণের তাগিদেও যে নিষ্ঠুর পরিণতির দিকে দ্রুত ধাবিত হয় এ ধরনের গল্পও লেখক আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন।

'শ্মশানের পথে' গল্পে এক অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবার দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে এক বঞ্চিত নারীর অসহায় জীবন কাহিনি।

দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামের প্রতিনিধি গোষ্ঠ। চিরদিন তার এমন ছিল না। গোষ্ঠের বাপের আমলে গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গাই, পুকুর ভরা মাছ সবই ছিল। কিন্তু এখন আর গ্রামের সুশ্রী নেই, পল্লীর ঐশ্বর্য যা কিছু সবই ছিল। কিন্তু সে শ্রী আর নাই, সব গিয়াছে।

> *"থাকিবে কি করিয়া? পল্লীর শ্রীই যে গিয়াছে। মূল মারলে*
> *ফুল বাঁচিবে কি করিয়া?"*[১১]

দামিনী ভালো ঘরের মেয়ে, পড়িয়াছিল ভালো ঘরে। কিন্তু দরিদ্র চাষী গোষ্ঠ দরিদ্রের কশাঘাতে বর্তমানে এতটাই জর্জরিত যে, রুগ্ন সন্তানের মুখে যে খাবার তুলে দিতে পারে না। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধুর ভালবাসার সম্পর্কে ফাটল ধরে। অথচ সুখের সংসারে দুজনের পারস্পরিক সম্পর্ক কতই ভালো ছিল, ছিল মধুরও।

> *"স্বামী কত ভালবাসিয়াছে, সে কত বাসিয়াছে কত চাওয়া,*
> *কত পাওয়া, সে বুঝি অন্তহীন বলিয়া মনে হইয়াছে।"*[১২]

এখন গোষ্ঠ প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও দামিনীকে ভালো কিছু দিতে পারে না। দামিনী ও স্বামীর আর্থিক অনটনের কথা ভেবে কিছু না চাওয়ায় সে নিজেই স্ত্রীর জন্য আহার্য সামগ্রী কিনে আনে। কিন্তু দামিনী তা নিজে না খেয়ে স্বামীকে খাওয়ালে গোষ্ঠের 'ক্ষোভে দুঃখে অন্তর মরিয়া ফেনাইয়া ওঠে।' অন্যদিকে গোষ্ঠ মুখের আহার সার গাদায় ফেলে দিলে দামিনীর মনে হয়, 'আমাকেই ফেলিয়া দিল'। হৃদয়ের অগ্নিদাহে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে দামিনীর এক অশান্তি এসে জুটেছিল প্রতিবেশী বাল্যসাথী সুবল দাস।

দামিনী সহানুভূতিশীল, সম্ভ্রমশীলা, পতিভক্তি পরায়ণা, সন্তান বাৎসল্যময়ী এক আত্মসচেতন নারী। পরস্ত্রী বলে সে বাল্যসাথী সুবলকে এড়িয়ে চলে। একসময় দুজনের প্রীতির সম্পর্ক গভীর ছিল। এখন সুবলকে দেখলে সে মাথায় কাপড় দেয়, মৃদু কণ্ঠে কথা বলে। সুবল বুঝে নেয় দামিনী এখন পর হয়ে গেছে। সুবল গান গেয়ে ভিক্ষা চেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে করতে মহাজন হয়ে গেছে। দামিনী ও গোষ্ঠ পরিবারের বিপদে সুবল নানাভাবে সাহায্য করে। দামিনীর মনে তাই সবসময় একটা ভয়-কাজ করে, সর্বস্ব দিয়াও আপন হওয়ার বা আপন করার সুযোগ বুঝি সুবল নিতে চাইছে। হত দরিদ্র, দৈন্যপীড়িত পল্লীজীবনে অসহায় নারী এই ভয়েরই শিকার হয়। অসুস্থ মৃতপায় ছেলেটিকে কবিরাজ দেখানোর জন্য সে সুবলের কাছে যায়, কারণ গোষ্ঠ একটু আগেই কোথায় চলে গেছে, 'তামাকের নেশায় ভোর হইয়া স্ত্রী-পুত্র ভুলিয়া বসিয়া আছে।' দামিনী তার হাতের চুড়ির বদলে সুবলের কাছে দুটো টাকা ধার চায়,

> *"এই আমার সোনার কাঁকন, তোমার পায়ে পড়ি মাহান্তো*
> *ও দুটো নিয়ে আমাকে দুটো টাকা দাও ছেলেটা বুঝি*
> *বাঁচে না।"*[১৩]

কবিরেজ দেখানোর জন্য ধার করা টাকাও দুর্বৃত্ত মহাজন গ্রাস করে নিয়েছে। টাকা না দিলে উপায় নেই। কারণ দাদন শোধ করতে না পারায় কাবুলিওয়ালা গোষ্ঠকে বলেছে,

> *"ঘটি-বাটি বাধা দাও, না থাকে পরিবারের শাঁখা খাড়ু*
> *বেচ। সে তো আমার দেখবার কথা নয়, আমার টাকা*
> *চাই-টাকা দাও।"*[১৪]

দামিনীকে বলে—

> *"তবু তুম আসো, তুমকো লিয়ে যাবে।"*[১৫]

দু-টাকা না দেবার জন্য গোষ্ঠ দামিনীর কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল। জীবনের তিক্ততায় বলে ফেলেছিল, 'মরুক ছেলে'। পুত্রশোকাতুরা অসহায় দামিনীর সমস্ত বিশ্ব সংসারটা যেন তখন বিষময় মনে হয়েছিল। এমতাবস্থায় দামিনীর অসুস্থ পুত্রকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া কোন সম্বল ছিল না। সুবল তখন গোষ্ঠের পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করেছে, ছেলের জন্য ডাক্তার এনেছে। দামিনী সুবলের সব কিছুতেই পাপের গন্ধ পেয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি দামিনীকে অসহায় করে ফেলেছে। গোষ্ঠ সুবলকে সহ্য করতে পারে না, তার জন্য সুবলেরও কিছু সংকোচ ছিল। সুবল সবার অগোচরে দামিনীর জন্য এক জোড়া শাখা কুলঙ্গিতে তুলে রাখলে দামিনী ভেবে নেয় গোষ্ঠ বোধ হয় তার জন্যে অভাব অনটনের সংসারে কষ্ট করে শাখা জোগাড় করেছে। নিরুপায় স্বামীটির জন্য এক মুহূর্তে দামিনীর মন সদয় হয়ে যায়। দামিনী মনের আনন্দে শাখা জোড়া হাতে তুলে নেয়। এর মধ্যে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে একমাত্র সন্তান মারা গেলে মৃত্যু শোকের উপর দামিনীর অন্য শোক বড় হয়ে ওঠে,

> *"গোষ্ঠ উন্মাদের মত চিৎকার করিয়া কহিল - রাক্ষুসী*
> *তুই আমার ছেলে খেলি, তোর পাপেই আমার ছেলে*
> *গেল। সর্বনাশী ছেলের চেয়ে তোর সুবল বড় হল, এক*
> *জোড়া শাঁখা বেশি হল—?"*[১৬]

ঘৃণায় বিস্ময়ে দামিনী স্তম্ভিত হয়ে গেল। পুত্রশোকাতুর অসহায় দামিনীর সংসার স্বামী সবই যেন বিষে পরিণত হয়ে গেল। নির্বোধ স্বামীর প্রতি দামিনীর তীব্র অভিমান সুবলের প্রতি ঘৃণা তাকে পাষাণী মূর্তিতে রূপান্তরিত করল। দামিনী চরিত্রের পাশে তারাশঙ্কর সুবল ও গোষ্ঠ চরিত্রকে সুযোগ সন্ধানী ও নির্বোধ রূপে অঙ্কন করেছেন। দারিদ্র্য ও নিষ্ঠুর পুরুষের কাছে হতভাগিনী দামিনী একেবারেই অসহায়। এখানে তারাশঙ্কর ব্যক্তি চরিত্রটিকে শ্রেণি চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন।

> *"নারী চায় জীবনের সকল দুঃখে অপমানে দারিদ্র্যে*
> *জীবনের সকল ঘাত প্রতিঘাতে পুরুষের সঙ্গে থাকিয়া*
> *তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে - এইখানেই সে অনুভব করে*
> *তাহার জীবনের দুর্লভ মূল্য - ইহাই তার জীবনের*
> *গর্ব।"*[১৭]

তারাশঙ্করের 'শ্মশানের পথে' গল্পের নারী চরিত্র দামিনী জীবনের এই দুর্লভমূল্য থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত দামিনী উপায়ন্তর না দেখে চাপরাসীর লেলিহান জিহ্বার হাত থেকে নারীত্বকে রক্ষা করতে ভীত কুরঙ্গিনীর মতোই তীব্র গতিতে ছুটে গিয়ে, মান মর্যাদা ভুলে গিয়ে সুবলকে বলেছিল,

> *"মাহান্তো আমাকে বাঁচাও।"*[১৮]

সুবল দামিনীকে অভয় দিলেও নারীদেহ স্পর্শে তার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠেছে। জমিদারের পাওনা টাকা সুবল শোধ করে দিলেও দামিনী এর মধ্যে পাপের ছাপ দেখতে পেয়েছে। দামিনীর মনে হয়েছে, সে যেন সুবলের কাছে বিক্রি হয়ে গেল।

আর্থিক অনটনে জর্জরিত পলায়ন মনোবৃত্তি সম্পন্ন স্বামীর উপর সে কোনো ভরসাই করতে পারেনি। দামিনী ভীত হয় কারণ সুবল তাদের জন্য এত করেছে বিনিময়ে যদি কিছু দাবি করে। এই টাকা শোধ দেওয়ার ব্যাপারে স্বামীর উপর কোনো ভরসাই সে করতে পারেনি। দামিনী নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় না, অথচ রাতের অন্ধকারে সুবল দামিনীকে ভোগ করে।

সুবলের আকাঙ্ক্ষায় দামিনী নীরবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে বিলিয়ে দেয়। এরপর দামিনী লজ্জায় ঘৃণায় পাথরের মতো বসে থাকে। নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার চেষ্টা করে। গোষ্ঠ এসে দামিনীকে গ্রামে বন্যা আসার সংবাদ দিলে, দামিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাই বলে,

"আর কত দেরি?"[১৯]

দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সুবল দামিনীর সর্বস্ব লুঠ করেছে, তাই দামিনীর কাছে মৃত্যুই শ্রেয়। বন্যার সংবাদে দামিনী তাই খুশী হয়েছে। একদিকে প্রতিদান অন্যদিকে সতীত্ব এই দুইয়ের মহিমায় দামিনী চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পরিবর্তনমান কাল প্রবাহে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর যতটা দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। মানুষের মনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার সাধ্য স্রষ্টারও ছিল না এটাই অনেক গল্পে প্রমাণিত হয়েছে। তারাশঙ্কর শুধু নারীর বাইরের আদল বা খোলসটাকে দেখেননি, তার ভেতরে নারীর যে সত্তা ছটফট করত তাকেও সূক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু সংকটদীর্ণ মানুষের যাবতীয় অন্তঃসার সে দিন শেষ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, তাঁর রচনায় তারও কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংসারের বাইরে আবর্জনার মধ্যে আবর্জনার মতে পড়ে থাকা শ্রেণির কথা বলতে গিয়ে কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সে কথা স্বীকার করে তারাশঙ্কর আমার কালের কথায় লিখেছেন,

"এদের দৃষ্টিতে সেদিন দেবতার ভোগ নষ্ট হত এদের
সঙ্গে একটা লম্বা খড় কি দড়ির সংস্পর্শে স্পর্শ দোষ
হলে প্রাপ্ত বয়স্কেরা স্নান করেছেন। এদের বাস্তুতে এরা
শুধু বাস করাবারই অধিকারী ছিল, ভূমিতে কোনো
অধিকারই ছিল না। ... ওরা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস
করেছে হীনকুলে জন্মাপরাধে ওরা সত্যই অস্পৃশ্য।
পরবর্তীকালে যখন সমাজ সেবার ব্রত নিয়ে তাদের
বুঝতে চেয়েছি যে, অস্পশ্যতা মানুষের সৃষ্টি, বিধাতার
নয়, তখন ওরা শিউরে উঠেছে, আমাদের সন্দেহের
চক্ষে দেখেছে।"[২০]

তারাশঙ্কর এই সমাজ বহির্ভূত অংশে আলো ফেলেছেন। সাহিত্যে এই নবধারায় তারাশঙ্করের স্বাতন্ত্র্য তাঁর অভিজ্ঞতার মৌলিকতায়, পরিবেশের প্রতি আন্তরিকতা আসক্তিতে আর সহানুভূতিতে। তারাশঙ্কর তাই নির্দ্বিধায় বলেছেন,

"আমি তাদের জানি - ওদের আত্মীয় আমি / উপকারী
নয়, কৃতজ্ঞতা ভাজন নয়, ভালোবাসার জন।"[২১]

তারাশঙ্করের গল্প মালা বিশাল বনস্পতির মতো। বনস্পতির যেমন বিশেষ পত্র পল্লব চোখে পড়ে না - ঠিক তেমনি তারাশঙ্করের গল্পে মানুষের জীবন ধারণের যে সংগ্রাম তাকে ছাঁপিয়ে উঠেছে লেখকের অনাসক্ত দৃষ্টি। গল্পে নারীর বিচিত্র রহস্য প্রকটিত হলেও প্রায় নারী চরিত্র, সত্যিকারের রক্তমাংসের জীবদেহে মানবধর্মের হারজিতের দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ।

গ্রন্থঋণ :

১। অধ্যাপক ভট্টাচার্য জগদীশ; সম্পাদনা 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' (প্রথম খণ্ড); সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৫, কলকাতা-০৯
২। অধ্যাপক ভট্টাচার্য জগদীশ; সম্পাদনা 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' (দ্বিতীয় খণ্ড); সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৬, কলকাতা-০৯
৩। গুপ্ত ক্ষেত্র; তারাশঙ্কর অনুসন্ধান ৯৮; সাহিত্য প্রকাশ; প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮, কলকাতা-০৯
৪। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর; আরাম কালের কথা; তারাশঙ্কর রচনাবলী (১০ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, সপ্তম মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৩
৫। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর; আমার সাহিত্য জীবন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম আকাদেমি সংস্করণ, ১৯৯৭, কলকাতা-১৫
৬। বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ; সম্পাদিত; তারাশঙ্কর অন্বেষা; পুস্তক বিপণি; প্রথম প্রকাশ-২০০৭, কলকাতা-০৪
৭। রায়চৌধুরী গোপিকানাথ; দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য; দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ-১৩৮০, কলকাতা-৭৩।

তথ্যসূত্র :

১। অধ্যাপক ভট্টাচার্য জগদীশ; সম্পাদনা, 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ('বেদেনী'), পৃঃ ২৩৫
২। তদেব; পৃঃ ২৪২
৩। তদেব; পৃঃ ২৪২
৪। তদেব; পৃঃ ২৪২
৫। অধ্যাপক ভট্টাচার্য জগদীশ; সম্পাদনা, 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ('তারিণী মাঝি'), পৃঃ ৩৬৫
৬। তদেব; পৃঃ ৪৬৩
৭। তদেব; পৃঃ ৪৬০
৮। তদেব; পৃঃ ৪৬৬
৯। তদেব; পৃঃ ৪৬৪
১০। তদেব; পৃঃ ৪৬৭
১১। অধ্যাপক ভট্টাচার্য জগদীশ; সম্পাদনা, 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ('শ্মশানের পথে'), পৃঃ ৮২
১২। তদেব; পৃঃ ৮২
১৩। তদেব; পৃঃ ৮২
১৪। তদেব; পৃঃ ৮৪
১৫। তদেব; পৃঃ ৮১
১৬। তদেব; পৃঃ ৮৮
১৭। রায়চৌধুরী গোপিকানাথ; দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য; দে'জ পাবলিশিং; পৃঃ ১২৫
১৮। অধ্যাপক ভট্টাচার্য জগদীশ; সম্পাদনা, 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ('শ্মশানের পথে'), পৃঃ ৯১
১৯। তদেব; পৃঃ ৯৩
২০। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর; 'আমার কালের কথা'; তারাশঙ্কর রচনাবলী (১০ম খণ্ড); মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স; পৃঃ ১১৭
২১। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, 'আমার সাহিত্য জীবন'; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (প্রথম পর্ব); পৃঃ ২৬